পরকালের পরাবাস্তবতা

আশা জেগে রয় চিরন্তন

বিজ্ঞান, পরলোক এবং জীবনের অর্থ

মূলঃ মাইকেল শারমার
ভাষান্তরঃ ফরিদ আহমেদ

[আমার ভয়াবহ অপছন্দের কাজের মধ্যে একটা হচ্ছে অনুবাদ করা। পারতপক্ষে এই রাস্তায় হাঁটা চলাই করি না আমি। এর পিছনে যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। প্রায়শই দেখা যায় যে, কোন এক ভাষার অতিশয় উপাদেয় জিনিষ অন্য ভাষায় অনুবাদের পর হয়ে গেছে লবণ- মসলা বিহীন তরকারীর মত পানসে এবং স্বাদহীন। শুধু স্বাদহীনই নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অনুবাদের পর তা হয়ে দাঁড়ায় ঘন ঘন স্পিড ব্রেকার লাগানো রাস্তার মতো উঁচুনিচু অমসৃন। পাঠককে প্রবল ঝাঁকি খেতে খেতে হাঁচড়ে পাঁচড়ে এগোতে হয় সেই রাস্তায় সীমাহীন বিরক্তি নিয়ে। ভিন্ন ভাষার লেখাকে কুড়মুড়ে সুস্বাদু এবং মসৃন গতিশীলে রূপান্তর করা যে কতখানি ঘাম ঝরানো কঠিন কাজ তা সেটা যে না করেছে তার পক্ষে বোঝা বড় কষ্টকর। আর ঘাম ঝরানো সব কাজের প্রতি আমার অনীহা প্রবল বলেই খুব সযত্নে অনুবাদ থেকে শতেক হস্ত দূরে থেকেছি এতদিন। তবে সেটা আর পারা গেল না এক হতচ্ছাড়া বিটকেলের জন্য। এই বিটকেলটা আর কেউ না। সে হচ্ছে অভি, আমাদের অভিজিৎ রায়।

মাতৃগর্ভ থেকেই বাঁকা ঘাড় নিয়ে জন্মানোর কারণে আমাকে দিয়ে আমার অপছন্দের কাজ করিয়ে নেওয়াটা যে কারো জন্যেই মোটামুটি অসম্ভব একটা ব্যাপার। তা সে যত অনুরোধ আর কাকুতি মিনতিই করা হোক না কেন। অনুরোধে ঢেঁকি যে খুশি গিলুক, যত খুশি গিলুক, কিন্তু আমি গিলবো না এটাই হচ্ছে আমার ধনুর্ভঙ্গ পণ। আমি যে অনুরোধে ঢেঁকি গিলি না সেটা কীভাবে কীভাবে যেন জেনে গেছে অভি। আর সে কারণেই কোন কাজ করানোর প্রয়োজন থাকলে আলগা তোয়াজ বাদ দিয়ে মাত্র এক লাইনের একটা মেইল দেয় সে, 'এইটা একটু কইরা দ্যান তো'। তারপরই বড়সড় একটা দম নিয়ে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য গভীর সাগরে ডুব দেয়ে। আঁতিপাঁতি খুঁজেও তার টিকিটির সন্ধান খুঁজে পাওয়া যায় না তখন আর। ডেডলাইনের আগ দিয়ে ঠিকঠিক হুশ করে ডলফিনের মত ভুশ করে ভেসে উঠে সে আবার তার টিকিসমেত। আরেকটা এক লাইনের মেইল আসে তখন, 'ওই মিয়া, আপনের লেখা কই?'। অবস্থাটা বোঝেন একবার। লেখাটা আদৌ লিখেছি কি লিখি নাই তার কোন খবরই নেই এর মধ্যে। যদি উত্তর দেই, 'লেখাতো লিখি নাই। পাঠাবো ক্যামনে'? তাহলে অবশ্যম্ভাবীভাবে নির্বিকার উত্তর আসবে, 'লিখ্যা ফালান। রাইতের মধ্যে পাঠায়া দেন'। এই রকম বিচিত্র অনুরোধে ঢেঁকি তো ঢেঁকি ঢাকেশ্বরী মন্দির পর্যন্ত গলা দিয়ে নেমে যাবে যে কোন লোকের। আমারও সেই একই দশা হয়েছে এবার। তবে

কিঞ্চিত সমস্যা হচ্ছে এই যে ঢাকেশ্বরী মন্দিরটা গলা দিয়ে না নেমে সেখানেই আটকে গেছে আমার। কি কারণে সেটা বলছি এখন।

আগেই বলেছি মোটামুটি প্রায় সব ক্ষেত্রেই অনুবাদের পর দুর্দান্ত সব লেখাগুলো হয়ে উঠে ম্যাড়মেড়ে পানসে এবং খরখরে অমসৃন ধরনের। এই সমস্যা দূরীকরণের জন্য অনেক ভাষান্তরকই আক্ষরিক অনুবাদ না করে ভাবানুবাদ করে থাকেন। কেননা, একেক ভাষায় বাক্য গঠন, ভাব প্রকাশ একেক রকম। যা সেই ভাষার সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আক্ষরিক অনুবাদ দিয়ে সেই জটিল বিষয়গুলোকে সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। সেই ভাষা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকাটা অনুবাদকের জন্য ভীষনভাবে জরুরী। একইসাথে জরুরী সেগুলোকে অনুবাদকের নিজের ভাষার পাঠকের সামনে বোধগম্য এবং সুস্বাদু উপায়ে পরিবেশন করা। এই জটিল অবস্থা এড়াতে ভাবানুবাদই হয়ে দাঁড়ায় তখন সবচেয়ে ভাল সমাধান। এতে করে ভাষার ছন্দময়তা এবং গতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভবপর হয়। ফলে পাঠকের কাছে তা হয়ে উঠে দারুণ উপভোগ্য এবং অতীব উপাদেয়। তবে ভাবানুবাদের বড় সমস্যা হচ্ছে এক্ষেত্রে অনেক সময়ই অনুবাদক ভাষার মাধুর্য্য এবং গতিশীলতা বজায় রাখতে গিয়ে আসল লেখকের মূল বক্তব্যকে খণ্ডিত বা বিকৃত করে ফেলেন। গল্প, উপন্যাসের ক্ষেত্রে এটা তেমন একটা সমস্যা না, বরং এক ধরনের সুবিধাই বলা যেতে পারে। কিন্তু সিরিয়াস লেখার ক্ষেত্রে বক্তব্যের খণ্ডিকরণ এবং বিকৃতি বড় ধরনের সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। আমাকেও এই প্রবন্ধটি ভাষান্তর করার আগে নিজের সাথে বেশ কিছুক্ষণ বোঝাপড়া করতে হয়েছে কোন পথ বেছে নেবো সেই ব্যাপারে। পরে অবশ্য দুটোকেই পরিত্যাজ্য ঘোষণা করে মাঝামাঝি একটা পথ বেছে নিয়েছি আমি। আমার এই ভাষান্তর আক্ষরিক অনুবাদও না আবার পুরোপুরি ভাবানুবাদও নয়। পাঠক যাতে পলে পলে হোচট না খায় সে কারণে ভাষার মসৃনতা বজায় রাখার জন্য আক্ষরিক অনুবাদ করিনি। আবার শারমারের বক্তব্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্য ভাবানুবাদের পথেও যাইনি আমি। না অনুবাদ, না ভাবানুবাদের বাংলা শব্দ কি হবে? যেটাই হোক না কেন, আমার ভাষান্তর সেই ক্যাটাগরিতেই পড়বে। এই আলগা মাতব্বরির জন্য বিদগ্ধ লোকজনের ভ্রু হয়তো কুঞ্চিত হবে। কিন্তু কি আর করা।

আমার ইংরেজী ভাষা জ্ঞানের চরম দৈন্যতার কারণে (দুঃখের বিষয় আর কি বলবো, বাংলাটাও খুব একটা ভাল জানি না আমি), এই কাজের সাহায্যের জন্য শরণাপন্ন হয়েছিলাম ইরতিশাদ ভাইয়ের। উনার সহযোগিতা ছাড়া না অনুবাদ না ভাবানুবাদের এই সংকর কাজটা সম্পন্ন করা আমার পক্ষে হয়তো সম্ভবপর হতো না। সে জন্য উনার প্রতি রইলো সবিশেষ কৃতজ্ঞতা এবং অনুরাগ। আর অনাবশ্যক এই জটিল কর্মে ঠেলে ঠুলে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য অভির প্রতি রইলো নিদারুণ বিতৃষ্ণা এবং বিরাগ।]

আমি একবার একটা বাম্পার স্টিকার দেখেছিলাম। তাতে লেখা ছিল,

'জঙ্গী অজ্ঞেয়বাদীঃ আমি জানি না, তবে আপনিও তা জানেন না' (*Militant Agnostic: I Don't Know and You Don't Either*)।

পরকাল সম্পর্কে এটাই আমার অবস্থান। আমিও কিছু জানি না, আপনারাও কিছু জানেন না। আমরা যদি নিশ্চিতভাবে জানতাম যে পরলোক বলে কিছু আছে তাহলে মৃত্যুকে এত ভয় পেতাম না। প্রিয়জনের মৃত্যুতে এরকম বুকভাঙ্গা আর্তনাদে মাতম করতাম না আমরা। এমনকি এই বিষয়ে বিতর্ক করারও হয়তো প্রয়োজন পড়তো না।

যেহেতু কেউই নিশ্চিতভাবে জানি না যে মৃত্যুর পর কি ঘটে, সেহেতু আমরা বিষয়টাকে ধর্ম, সাহিত্য, কবিতা, বিজ্ঞান বা হাস্যরসের মত ভিন্ন ভিন্ন উপায় দিয়ে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করি। সদা উদ্বিগ্ন উডি এলেন এর বিকল্প সমাধান করেছিলেন এভাবেঃ 'আমি যে মারা যেতে ভয় পাই তা কিন্তু না, তবে যখন মৃত্যু ঘটবে তখন আমি সেখানে থাকতে চাই না'। স্টিভেন রাইটও ভেবেছিলেন যে তিনি এর সমাধান বের করে ফেলেছেন এভাবেঃ 'আমি চিরকাল বাঁচতে চাই। যত দূর সম্ভব, যত খানি সম্ভব'।

ঠাট্টা তামাশা আপাতত বাদ দেই। যেহেতু আমি একজন বিজ্ঞানী এবং এবং মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রয়েছে বলে দাবি করা হয় সেহেতু আসুন আমরা সেই সংশয়াচ্ছন্ন ভবিষ্যতের ডাটা বিশ্লেষণ করি এবং তা আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা কি ধরনের অর্থ বহন করে তাই বরং বিবেচনা করি।

একুশ গ্রামঃ আত্মার প্রকৃতি

শারীরিক মৃত্যুর পর মানুষের কি টিকে থাকে বলে মনে করা হয়? এর উত্তর হচ্ছে আত্মা। পৃথিবীতে যত ধরনের ধর্ম বা আধ্যাত্মিক আন্দোলন আছে ঠিক তত ধরনেরই আত্মা সম্পর্কে ব্যাখ্যা চালু রয়েছে। সাধারণ বিশ্বাস হচ্ছে যে, আত্মা হচ্ছে সচেতন চিরন্তন বস্তু যা জীবিতের অনুপম নির্যাস এবং দৈহিক মৃত্যুর পরও তা টিকে থাকে'।

আত্মার প্রাচীন হিব্রু শব্দ হচ্ছে 'নেপেশ', বা 'জীবন' বা 'প্রাণশক্তি'। গ্রীক শব্দ হচ্ছে 'সাইকি', বা 'মন'। এবং ল্যাটিন শব্দ হচ্ছে 'এনিমা' বা 'অতিপ্রাকৃত সত্তা', বা 'শ্বাস-প্রশ্বাস'। শরীরে স্পন্দন আনা, প্রাণ চাঞ্চল্য আনা এবং জীবনীশক্তির মূল নির্যাস হচ্ছে আত্মা। এটা মোটেও আশ্চর্যজনক নয় যে প্রাকৃতিক জগত সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবের কারণে এই ধারণাসমূহ যখন প্রথম গড়ে উঠছিল, তখন প্রাচীন মানুষেরা মন, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং আত্মার মত সাময়িক রূপকের আশ্রয় নিয়েছিল । এই মুহূর্তে ছোট্ট যে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করছে, উত্তেজনায় লাফালাফি করছে বা আনন্দে লেজ নাড়াচ্ছে, ক্ষণকাল পরে সেই পরিণত হচ্ছে এক খণ্ড অনড় মাংসপিণ্ডে। আসলে কি ঘটছে সেই মুহূর্তে?

আসলে কি ঘটছে সেটা উদঘাটন করার জন্যে ১৯০৭ সালে ম্যাসাচুসেটস এর চিকিৎসক ডানকান ম্যাকডোগাল ছয় জন রোগীর মারা যাওয়ার আগের এবং পরের ওজন নেন। তিনি মেডিকেল জার্নাল American Medicine এ জানান যে ওই সমস্ত ব্যক্তিদের মৃত্যুর আগের এবং পরের ওজনের পার্থক্য ২১ গ্রাম। যদিও তার ওজন পদ্ধতি ছিল খুবই স্থুল ধরনের এবং হেরফেরমূলক এবং কেউই তার ফলাফলের অনুরূপ ফলাফল পরবর্তীতে আর পায়নি, তা সত্ত্বেও আত্মার ওজন হিসাবে ছয় গ্রাম মোটামুটি কিংবদন্তির রূপ পেয়ে যায়। এই গবেষণার আসল তাৎপর্য হচ্ছে আত্মা এমন একটা জিনিষ যাকে পরিমাপ করা যায়। কিন্তু আসলেই কি তা সম্ভব?

বিজ্ঞানে আমরা আমাদের ধারণাগুলোকে নিখুঁতভাবে সংজ্ঞায়িত করি। আমি 'আত্মাকে' সংজ্ঞায়িত করি এভাবে, 'একজন ব্যক্তির মৌলিক গুণাবলীর প্রতিনিধিত্বকারী অনুপম তথ্যের প্যাটার্ন'। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, আমরা মারা যাওয়ার পর আমাদের ব্যক্তিগত তথ্যের পাটার্নকে সংরক্ষণের কোন মাধ্যম না থাকলে আমাদের মৃত্যুর সাথে সাথে আত্মাও মৃত্যুবরণ করে। ডিএনএ দ্বারা সংকেতলিপিবদ্ধ প্রোটিন দিয়ে আমাদের দেহ গঠিত। কাজেই ডিএনএর বিখণ্ডায়নের সাথে সাথে আমাদের প্রোটিন প্যাটার্ন চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। মস্তিষ্কের মধ্যে বিরাজমান নিউরনের প্যাটার্নের মধ্যে আমাদের স্মৃতি এবং ব্যক্তিত্ব সংরক্ষিত থাকে। কাজেই যখন ওই নিউরনগুলো মারা যায় তখন তার সাথে সাথে আমাদের স্মৃতি এবং ব্যক্তিত্বও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। স্ট্রোক এবং আলযেইমার রোগের মতোই চরমভাবে স্মৃতিকে বিধ্বস্ত করে দেয়, তবে একেবারে পাকাপাকি এই যা।

যেহেতু মস্তিষ্ক নিজে কিছু উপলব্ধি করে না, সেহেতু এটা মানসিক কার্যকলাপকে ভিন্ন উৎসের উপর চাপিয়ে দেয়। অতিপ্রাকৃত অস্তিত্বসমূহ যেমন, ভূত-প্রেত, দেবদূত এবং ভিনগ্রহের প্রাণীদেরকে সত্যিকারের প্রাণী বলে বিবেচনা করা হয়। মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতাকে অন্তর্নিহিত কার্যকলাপ হিসাবে বিবেচনা না করে বহির্কার্যকলাপ হিসাবে ধারণা করা হয়। একইভাবে, তথ্যের স্নায়বীয় প্যাটার্ন, যা হচ্ছে আমাদের স্মৃতি এবং ব্যক্তিত্ব – আমাদের 'আমিত্ব', তাকে আত্মা হিসাবে ভাবা হয়। এই প্রেক্ষিতে, আত্মা হচ্ছে এক ধরনের বিভ্রম।

বিজ্ঞান কি আমাদের রক্ষা করতে পারে?

আমার বিভিন্ন গ্রন্থ এবং প্রবন্ধগুলোতে কীভাবে আমরা মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারি সে সম্পর্কে অনেক বৈজ্ঞানিক পরিস্থিতিকে আমি মূল্যায়ন করেছি। তবে এইখানে আমি ২০০৬ সালে লেখা দীপক চোপড়ার বই Life After Death: Burden of Proof এ পরলোকের অস্তিত্বের স্বপক্ষের প্রমাণাদির সর্বশেষ দাবি নিয়ে আলোচনা করবো। দীপক চোপড়ার মতে, ছয় ধরনের প্রমাণের প্রেক্ষিতেই তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছেন যে, আত্মা বাস্তব এবং চিরন্তন।

> ১. *মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতা এবং চেতনার পরিবর্তিত অবস্থাঃ* হাজার হাজার লোক আছে যাদেরকে হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে তারা দিব্যি বেঁচে বর্তে উঠেছে এবং পরলোকের কিছু অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছে। এই অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্যে আছে শরীর থেকে বের হয়ে ভেসে বেড়ানো, সুড়ঙ্গ বা সাদা আলোর

মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা, ভালবাসার লোকজন অথবা ঈশ্বর বা যীশুকে দর্শন কিংবা অন্যলোকের কোন স্বর্গীয় বর্ণনা ইত্যাদি। যদি এই রোগীদের মস্তিষ্ক মৃত হয়ে থাকে তবে তাদের সচেতন 'আমিত্ব', তাদের 'আত্মা' নিশ্চয়ই দেহের মৃত্যুর পরও বেঁচে ছিল।

২. *ইএসপি এবং মনের প্রমাণঃ* এখানে চোপড়া দূরদর্শন এবং টেলিপ্যাথির জন্য psi গবেষণার উপর নির্ভর করেছেন। এক্ষেত্রে গবেষণায় ব্যবহৃত ব্যক্তিদেরকে একা কোন রুমে আটকে রাখলেও তারা পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করা ছাড়াই অন্য কোন রুমে কি ঘটছে তা দেখতে পারে।

৩. *কোয়ান্টাম সচেতনতাঃ* কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জগতে দেখা গেছে, পারমানবিক কণাদের গতিবিধির উপর পরীক্ষা-নিরিক্ষা দূরবর্তী অঞ্চলে অনিশ্চিত প্রভাব তৈরি করে, আইনস্টাইন জাকে বলতেন - 'স্পুকি একশন এট এ ডিসটেন্স'। এক স্থানের কণার উপর পর্যবেক্ষণ তাৎক্ষনিকভাবেই অন্য কোন দূরবর্তী (তাত্ত্বিকভাবে বহু দূরের দুই গ্যালাক্সিতেও হতে পারে) স্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কণাকে প্রভাবিত করে। এটা আপাত দৃষ্টিতে আইনস্টাইনের আলোর গতির সর্বোচ্চ সীমার লঙ্ঘন বলেই মনে হয় । চোপড়া এর অর্থ করেছেন এভাবে যে, মহাবিশ্ব এক বিশাল কোয়ান্টাম ক্ষেত্র, যেখানে সব কিছুই (এবং সবাই) আন্তঃসম্পর্কযুক্ত এবং একে অন্যকে সরাসরি এবং তাৎক্ষনিকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। দীপক চোপড়াএবং অন্যেরা কীভাবে মস্তিষ্ক জৈব-রাসায়নিক সংকেতের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বস্তুজগতকে প্রতিনিধিত্ব করে তা ব্যাখ্যা করার জন্য কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে প্রয়োগ করেছেন - 'কোয়ান্টাম সচেতনতার মাধ্যমে আমরা হয়তো জানতে পারবো মস্তিষ্ক কীভাবে যাকে আমরা স্বর্গ বলে জানি সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাল্পনিক জগতসমূহ তৈরি করে থাকে। যদি এই রহস্য মস্তিষ্কের রসায়নের মধ্যে না থেকে বরং সচেতনতার মধ্যে থাকে তবে পরলোক দূর কোন রহস্যময় জগত না হয়ে আমাদের বর্তমান জীবনেরই বর্ধিতাংশ হতে পারে।'

৪. *আধ্যাত্মিক মাধ্যম এবং মৃতের সাথে কথোপকথনঃ* দীপক আধ্যাত্মিক মাধ্যম এবং তাদের মৃত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগের আপাত প্রতীয়মান সক্ষমতার উপর করা গবেষণাসমূহের ব্যাপক পর্যালোচনা করেছেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্ত করেছেন যে তিনি নিজেও এরকম এক গবেষণায় অংশ নিয়েছিলেন। সেই পরীক্ষণে তিনি তার মৃত বাবার সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দীপকের বাবার সাম্প্রতিক মৃত্যুই তাকে এই ধরনের গবেষণা এবং এই বই লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে।

৫. *প্রার্থনা এবং রোগ নিরাময় গবেষণাঃ* চোপড়া ফলদায়ক দূরবর্তী প্রার্থনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। রোগীর সুস্থতার জন্য অনেক দূর থেকে অজানা ব্যক্তিরা প্রার্থনা করলে, প্রার্থনা না করা রোগীদের তুলনায় তারা অনেক দ্রুত আরোগ্য লাভ করে। এর মূল অর্থ হচ্ছে যে, চিন্তার মাধ্যমে দূর কোন কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কোন দেবতার হস্তক্ষেপেই হোক বা

কোন মহাজাগতিক শক্তির কারণেই হোক না কেন এ ধরনের শক্তি প্রদর্শন করা সম্ভব। এর মাধ্যমেই আমরা বিশ্বজগৎ এবং এর অন্তর্ভুক্ত সব কিছুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হই।

৬. তথ্য ক্ষেত্র, মরফিক অনুরণন এবং বিশ্বজনীন জীবন শক্তিঃ চোপড়া দাবি করেছেন যে প্রকৃতি তথ্য ক্ষেত্রের মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ করে থাকে। তিনি এক্ষেত্রে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী রুপার্ট শেলড্রেক (Rupert Sheldrake) পরিচালিত গবেষণাসমূহের উল্লেখ করেছেন। রুপার্ট শেলড্রেক প্রমাণ হাজির করেছেন যে, কেউ যখন পিছন থেকে কারো দিকে তাকিয়ে থাকে তখন তারা তা উপলব্ধি করতে পারে। কুকুরেরা জানে কখন তাদের মনিবেরা বাড়িতে ফিরছে। দেখা গেছে শব্দজট (crossword puzzle) বেলা গড়িয়ে গেলে সমাধান করা সহজতর, কারণ তখন অনেক লোকই এর সমাধান করে ফেলেছে এবং সে সমস্ত তথ্য প্রকৃতিতে রয়ে গেছে। সব জীবিত সত্তাকে একে অন্যের সাথে সংযোগকারী ‘মরফিক অনুরণন ক্ষেত্র’ দিয়ে এবং আরো অনেক রহস্যময় অতিপ্রাকৃতিক বিষয়সমূহকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তারা বলেন, তথ্যকে সৃষ্টিও করা যায় না বা একে বিনাশও করা যায় না। কেবলমাত্র নতুন প্যাটার্নে পরিবর্তিত করা যায়। কাজেই এই সংজ্ঞা অনুযায়ী আমাদের ‘আত্মা’ হচ্ছে আসলে তথ্যের আধার যা জন্মের আগেও ছিল এবং মৃত্যুর পরেও তা বহাল তবিয়তে টিকে থাকবে অর্থাৎ আত্মা অবিনশ্বর।

দীপক চোপড়ার মতে এই ছয় ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ হাজার বছর আগে বৈদিক ভারতের হিন্দু ধর্মের প্রথম আধ্যাত্মিক নেতা মহাজ্ঞানী মুনি ঋষিরা বর্ণনা করে গেছেন। ‘ঋষিরা বিশ্বাস করতেন যে জ্ঞান জ্ঞানীর কাছে বহিস্থ কিছু নয় বরং তা তার চেতনার মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। কাজেই জীবন এবং মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনে তাদের কোন বহিরাগত ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই। আমাদের সত্ত্বার নির্যাস হচ্ছে soul (অন্তর্গত সত্ত্বা), যাকে ঋষিরা আত্মা বলতেন। Soul এবং আত্মা হচ্ছে অদৃশ্য স্বর্গীয় ঝলক যা রক্ত মাংসের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি নিয়ে আসে। অন্যদিকে বেদান্তের আত্মা ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; আর এখানেই সবচেয়ে বড় পার্থক্যটা নিহিত। খ্রীস্টীয় soul-এর মতো আত্মা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসতে বা যেতে পারে না। মানুষ এবং স্বর্গীয়তার মধ্যে একধরনের ঐক্য রয়েছে’।

আমি স্বীকার করছি যে আমার পশ্চিমা বৈজ্ঞানিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি কারণে দীপক কি বলতে চাচ্ছে তা সঠিকভাবে বুঝতে দারুণভাবে অসুবিধা হচ্ছে (যা মাঝে মাঝে খুবই হতাশাজনক)। আমি নিশ্চিত যে, আমার কোন ভুল হলে দীপক তা শুধ্‌রে দেবে। আমি যা বুঝেছি তার সারাংশ এরকম। বিশ্বজগৎ হচ্ছে সময়হীন শক্তির এক দৈত্যাকার সচেতন তথ্য ক্ষেত্র যার অংশ আমরা সকলেই। জীবন এই অন্তহীন সচেতন ক্ষেত্র থেকে সাময়িকভাবে উদ্ভাবিত। তার মতে এই ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরকমঃ ‘ক্ষেত্রটা পূর্নাঙ্গরূপে কাজ করে। দূরবর্তী ঘটনাসমূহের মধ্যে এটা তাৎক্ষনিকভাবে সংযোগ সাধন করে। এই ক্ষেত্র সব ঘটনাকেই স্মরণ রাখে। এর অবস্থান কাল এবং স্থানের উর্ধ্বে। এটা সৃষ্টি হয় সম্পূর্ণভাবেই এর নিজের মধ্যে এবং এর সৃষ্টি উদ্ভূত এবং সম্প্রসারিত হয় বিবর্তনীয় দিকে। এটি একটি সচেতন ক্ষেত্র’। চোপড়া বলেছেন যে সুপ্রাচীনকালে ঋষিরা যা আবিষ্কার করেছিলেন তা আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাথে চমৎকারভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণঃ ‘প্রতিটা

ইলেকট্রন, প্রত্যেকটা চিন্তা, সময়ের একেকটা মুহূর্তের মধ্যে বিরাজমান ব্যবধানের কারণে প্রকৃতির প্রতিটি প্রপঞ্চের কাছে সচেতনতার ক্ষেত্র প্রাথমিক'। এই ব্যবধানই হচ্ছে রেফারেন্স বিন্দু, সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুর স্থবিরতা, যেখানে মহাবিশ্বের সকল ঘটনাসমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়।

চোপড়ার পরলোকের তত্ত্বে জীবন এবং মৃত্যু সচেতনতার দিকে বা সচেতনতা থেকে শুধুমাত্র ক্রান্তিকাল ছাড়া আর কিছুই নয়। ' আগের মুহূর্তকে অবসান করেই যেহেতু পরের মুহূর্তকে আসতে হয়, সেহেতু মৃত্যু ছাড়া কোন বর্তমান মুহূর্ত নেই'। কাজেই তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, 'আমরা অন্তহীনভাবে পুনর্নির্মিত মহাবিশ্বে বসবাস করি'। মৃত্যুকে ভয় করার কোন কারণ নেই কেননা 'আমি যা ধারণ করি তা মৃত্যু নয়, বরং আমি কি হতে পারি সেটাই মৃত্যু। আজ আমি নিজেকে দেখছি সময়ের শিশু হিসাবে, কিন্তু আমি হতে পারি অনন্ত সময়ের শিশু'। পরিশেষে চোপড়া উপসংহার টেনেছেন এভাবে যে, ' আমরা আমাদের পুরনো পরিচয় অভিজ্ঞতার 'আমিত্ব'-আত্মার পরিচয়ের কাছে ফেলে দিয়ে এক বিশ্ব থেকে আরেক বিশ্বে চলাচল করি এবং আমরা আমাদের পরবর্তী শরীরে সম্পূর্ণ নতুন এক অনুপম জীবনের উপাদানসমূহ জড়ো করি'।

বাস্তবতা যাচাইঃ বিজ্ঞান আসলে কি বলে

আসুন ফিরে আসা যাক বাস্তবতায়। প্রকৃত সত্য কিন্তু ভিন্ন রকম। গত পঁঞ্চাশ বছরে পৃথিবীতে আনুমানিক ১০৬ বিলিয়ন মানুষ জন্ম গ্রহণ করেছে। এখনকার জীবিত ছয় বিলিওন মানুষকে বাদ দিয়ে এর আগের একশ বিলিওনের সকলেই মারা গেছে এবং তাদের মধ্যে কেউই কখনো দুনিয়াতে ফিরে এসে আমাদের সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত করেনি যে পরলোক বলে কিছু আছে। এই উপাত্তসমূহ অমরত্বের প্রত্যাশা এবং পরলোকের দাবিকে সেভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। তারপরও আসুন একটা একটা করে এগুলোকে পর্যালোচনা করা যাক।

মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতা এবং চেতনার পরিবর্তিত অবস্থা

পাঁচশ' বছর আগে ইনকুবি এবং সুকুবির রূপ নিয়ে অশুভ শক্তি তাদের শিকারদের বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় জ্বালাতন করেছে। দুইশ' বছর আগে ভূত এবং প্রেতরা সারারাত ধরে হয়রানি করেছে লোকজনকে। গত শতাব্দীতে ধূসর এবং সবুজ বর্ণের ভিনগ্রহের বাসিন্দারা মানুষদের তাদের বিছানা থেকে ধরে ধরে নিয়ে গেছে তাদের মহাকাশীয় গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার করার জন্য। আর এই যুগে এসে মানুষ মুখোমুখি হচ্ছে মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতার। মুখোমুখি হচ্ছে আত্মা বাবাজীর হরহামেশা শরীরের বাইরে চলে যাওয়া, শরীর থেকে আলাদা হয়ে ভেসে বেড়ানোর ছেলেমানুষি ইচ্ছার। ভেসে ভেসে আত্মা বাবাজী চলে যাচ্ছে কখনো আঙিনার বাইর। কখনো বা শুধুমাত্র আঙিনা পার হয়েই সন্তুষ্ট থাকছে না তা। চলে যাচ্ছে একেবারে পৃথিবী ছেড়ে মহাশূন্যের অসীম অন্তহীনতায়।

কি ঘটছে এগুলো? এই সকল পরাবাস্তব প্রাণী এবং রহস্যময় প্রপঞ্চসমূহ কি বাস্তবতা নাকি সবটুকুই আমাদের মনের মাধুরী মেশানো কল্পনা? বিজ্ঞানের নতুন তথ্য প্রমাণ ধারণা দিচ্ছে যে এই বিষয়গুলো প্রকৃতপক্ষে মস্তিষ্কের কারসাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। স্নায়ুবিজ্ঞানী মাইকেল পারসিংগার (Miachael

Persinger) তার ক্যানাডার সাডবেরিতে অবস্থিত লরেন্টিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে লোকজনদের Temoporal lobe এ চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের প্যাটার্ন তৈরি করে এর সবগুলো অভিজ্ঞতাই তাদেরকে দিতে পেরেছিলেন। আমি নিজেও এরকম এক পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলাম এবং সেই সময় সামান্য হলেও আমার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

একইভাবে, ন্যাচার পত্রিকার ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০০২ সালের সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে যে, সুইস স্নায়ুবিজ্ঞানী ওলাফ ব্লাংকে (Olaf Blanke) এবং তার সহকর্মীরা আবিষ্কার করেছেন যে তারা তেতাল্লিশ বছর বয়স্ক এক মৃগী রোগিণীর টেমপোরাল লোবের সঠিক এঙ্গুলার জাইরাসে বৈদ্যুতিক উদ্দীপনার মাধ্যমে শরীর বিচ্যুত অভিজ্ঞতা (Out-of-body experience, সংক্ষেপে OBE)) আনতে সক্ষম হয়েছেন। প্রাথমিক স্বল্প উদ্দীপনায় ভদ্রমহিলা ‘বিছানায় ডেবে যাচ্ছি’ বা ‘উঁচু থেকে পড়ে যাচ্ছি’ ইত্যাদি অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। কিছুটা বেশি পরিমাণে উদ্দীপনার পরে ‘নিজেকে বিছানায় শোয়া দেখতে পাচ্ছি, তবে শুধু আমার পা এবং নিচের অংশ দেখতে পাচ্ছি’ বলেছেন। আরো অধিক উদ্দীপ্ত করার পর ভদ্রমহিলার তাৎক্ষণিক অনুভূতি হলো ‘ওজনহীনতা’ এবং ‘দুই মিটার উঁচুতে সিলিং এর কাছাকাছি ভাসছি’ এরকম।

২০০১ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ Why God Won’t Go Away’তে একই ধরনের একটি গবেষণায় উল্লেখ করা হয় যে, গবেষক এন্ড্রু নিউবার্গ (Andrew Newberg) এবং গবেষক ইউজিনি দ্য আকুইলি (Eugene D’Aquili) দেখতে পেয়েছেন যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এবং ফ্রানসিসকান সন্ন্যাসিনীরা যখন ধ্যান করে তখন তাদের মস্তিষ্কের স্ক্যান Posterior superior parietal lobe এ বিস্ময়করভাবে স্বল্প কর্মচাঞ্চল্য প্রদর্শন করে। Posterior superior parietal lobe কে লেখকদ্বয় Orientation Association Area (OAA) বলে উল্লেখ করেছেন, যার কাজ হচ্ছে শরীরকে বস্তুগত দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা দেওয়া (যে সকল লোকের এই অংশ বিনষ্ট হয়েছে তাদের কোথাও যাওয়ার রাস্তা খুঁজে পেতে বেশ বেগ পেতে হয়।)। যখন OAA উদ্দীপ্ত হয় এবং সঠিকভাবে কাজ করতে থাকে তখন সত্তা এবং অ-সত্তার মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য থাকে। গভীর ধ্যান বা প্রার্থনার সময় যখন OAA ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে তখন ওই পার্থক্য ঘুচে যেয়ে বাস্তবতা এবং কল্পনা, শরীর অনুভব এবং শরীর বিচ্ছিন্নতার অনুভবের মধ্যকার সীমারেখা ঝাঁপসা হয়ে উঠে। সম্ভবত একারণেই ভিক্ষুরা বিশ্বজগতের সাথে একাত্মতা অনুভব করে বা সন্ন্যাসিনীরা ঈশ্বরের উপস্থিতি টের পায়, কিংবা ভিনগ্রহবাসীদের দ্বারা অপহৃত ব্যক্তিরা বিছানা ছেড়ে উড়ে যেতে থাকে অন্য জগৎ থেকে আসা মূল নভোযানের দিকে।

কারো কারো ক্ষেত্রে কখনো কখনো বড় ধরনের শারীরিক বা মানসিক আঘাতের কারণেও ওই ধরনের অভিজ্ঞতার সূত্রপাত হতে পারে। Lancet এর ডিসেম্বর ২০০১ সংখ্যা একটি ডাচ গবেষণার কথা উল্লেখ করেছে যেখানে ৩৪৪ জন হৃদ্‌রোগী ক্লিনিক্যাল ডেথ অবস্থা থেকে বেঁচে ফিরে এসেছে। এদের মধ্যে বারো শতাংশ মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছে। মরণপ্রান্তিক সেই অভিজ্ঞতায় তারা তাদের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেসে বেড়িয়েছে এবং সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে আলোর দেখা পেয়েছে। কেউ কেউ আবার সেই সময় মৃত আত্মীয় স্বজনের সাথে টুকটাক সুখ দুঃখের কথা টথাও সেরে ফেলেছে বলে জানিয়েছে।

এই সব ঘটনার সাধারণ ব্যাখ্যা হচ্ছে যে, যেহেতু আমাদের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার উদ্দীপক বাইরে থেকে মস্তিষ্কে আসে, কাজেই যখন মস্তিষ্কের একটা অংশ মস্তিষ্কের ভিতরেই অস্বাভাবিকভাবে এই বিভ্রম তৈরি করে তখন মস্তিষ্কের অন্য অংশ বহিরাগত বিষয় হিসাবে সেগুলোকে চিহ্নিত করে। ফলে, অস্বাভাবিক বিষয়কে মনে করা হয় অতিপ্রাকৃতিক বিষয় বলে। বাস্তবে এটা কেবলমাত্র মস্তিষ্কের রসায়ন ছাড়া আর কিছুই নয়।

আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, NDE এবং OBE এর মধ্যে জৈব-রাসায়নিক সম্পর্ক রয়েছে। আমরা জানি যে আকাশে উড়ার হ্যালুসিনেশন এট্রোপাইন এবং অন্যান্য বিষাক্ত এলকোয়েডের কারণে ঘটে থাকে। এদের কিছু কিছুকে পাওয়া যায় ম্যানড্রেক এবং জিমসন আগাছার মধ্যে। ইউরোপিয়ান ডাকিনীরা এবং আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ান শ্যামানরা এগুলোকে যত্রতত্র ব্যবহার করতো। কেটামাইনস (Ketamines) এর মত অনুভূতিনাশকের কারণে খুব সহজেই OBE সংঘটন করানো সম্ভব। DMT (dimethyl-tryptamine) জগৎকে সম্প্রসারণশীল বা সংকুচিত হওয়ার অনুভূতির জন্ম দেয়। LSD দৃষ্টিভ্রম এবং শ্রবনভ্রম তৈরি করে অন্যান্য অনেক অনুভূতির মধ্যে বিশ্বজগতের সাথে একাত্মতার অনুভূতির জন্ম দেয়। ওই ধরনের কৃত্রিমভাবে তৈরি রাসায়নিক উপাদানের গ্রহণ উন্মুখ এলাকা থাকার অর্থই হচ্ছে মস্তিষ্কের স্বাভাবিকভাবে তৈরি রাসায়নিক উপাদান কিছু পরিস্থিতিতে (উদাহরণস্বরূপ, শারীরিক বা মানসিক ভয়ানক আঘাত বা দুর্ঘটনা) মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতার কোন একটি অথবা সকল অনুভূতিরই বিকাশ ঘটাতে পারে। কাজেই, আজরাইলকে মাথার কাছে দেখার চরম যন্ত্রণা থেকে লাগামহীন ‘ভ্রমনের’ রূপে মরণপ্রান্তিক এবং শরীর বিচ্ছিন্নতার অভিজ্ঞতা হতে পারে।

কেন ভিন্ন ভিন্ন লোক সুড়ঙ্গেরর মত একই ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে সেটা দেখানোর মাধ্যমে মনোবিজ্ঞানী এবং পরাবাস্তব গবেষক সুসান ব্লাকমোর (Susan Blackmore) হ্যালুসিনেশন হাইপোথেসিসকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। রেটিনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য মস্তিষ্কের পিছনের দিকে অবস্থিত ভিস্যুয়াল কর্টেক্সে প্রক্রিয়াজাত করানো হয়। হ্যালুসেনিক ওষুধসমূহ এবং মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাব এই এলাকায় স্বাভাবিক স্নায়ু কোষের উৎক্ষেপণের হার এর সাথে ঝামেলা পাকাতে পারে। এটা যখন ঘটে তখন স্নায়বিক কার্যক্রমের ‘ডোরাকাটা দাগ’ (Stripes) ভিস্যুয়াল কর্টেক্সের দিকে অগ্রসর হয়। এটাকেই তখন মস্তিষ্ক কেন্দ্রীভূত বৃত্ত বা সর্পিল কুণ্ডলী রূপ বলে ধরে নেয়। এই সর্পিলাকার কুণ্ডলীলেই সুড়ঙ্গ হিসাবে হয়তো দেখা যায়। একইভাবে, দেহ বিচ্যুতির ক্ষেত্রে উপর থেকে ভাসমান অবস্থায় দেখার বিষয়টা প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া ‘বিকেন্দ্রীকরণ’ এর সম্প্রসারিত ধরন। নিজেকে সমুদ্র সৈকতে বসে থাকা বা পর্বত আরোহণ করা কল্পনা করা সাধারণত উপর থেকে নিচের জিনিষ দেখার মত।

মস্তিষ্ক এবং মন যে একই জিনিষ তা এই গবেষণা কর্মগুলোই প্রমাণ। সকল অভিজ্ঞতাই আসলে গৃহিত হয় মস্তিষ্কের মাধ্যমে। কর্টেক্স এর মত বৃহৎ এলাকা টেম্পোরাল লোবের মত ক্ষুদ্র এলাকার কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে। এই ক্ষুদ্র এলাকাগুলো আবার এঙ্গুলার জাইরাসের (Angular Gyrus) মত আরো ক্ষুদ্র এলাকাগুলোর স্নায়বিক ঘটনাসমূহের মধ্যে তুলনা করে। এই লঘুকরণ একক নিউরন পর্যায় পর্যন্ত চলতে থাকে। এই পর্যায়ে কোন ব্যক্তি পরিচিত কাউকে দেখতে পেলে তার মস্তিষ্কে ‘দিদিমা নিউরন’ নামে পরিচিত খুব নির্বাচিত কিছু নিউরনসমূহ চঞ্চল হয়ে উঠে। UCLA এর নিউরোসার্জন আইজাক ফ্রিড (Itzhak Fried) এর সহযোগিতায় ক্যালটেক এর স্নায়ু বিজ্ঞানী ক্রিস্টল কোচ (Christol Koch) এবং গ্যাব্রিয়েল

ক্রেইম্যান (Gabriel Kreiman) গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকে বিল ক্লিন্টনের ছবি দেখানোর পর একটিমাত্র নিউরনকে চঞ্চল হতে দেখেছেন। 'মণিকা নিউরন' যে এর খুব কাছাকাছি সংযুক্ত হতে বাধ্য তা বলাই বাহুল্য।

চেতনার স্নায়বিক সম্পর্ক খোঁজার সূত্রপাত হয় এই মৌলিক পর্যায় থেকে। এবং তারপর স্নায়বিক সংযোগের এই সরলতর ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত চিন্তার জটিল সিস্টেমের বিকাশমান উপাদান খোঁজার জন্য আমরা সেখান থেকে ক্রমশ অগ্রসর হই। আমরা যা প্রত্যক্ষ করি সেটাকে দার্শনিকেরা বলে থাকেন কোয়ালিয়া (Qualia) বা স্নায়বীয় ঘটনাসমূহের সংযোগের কারণে উদ্ভূত চিন্তা এবং অনুভূতির মনোগত অবস্থা। তবে এটা ঠিক এক সময় না এক সময় বিজ্ঞানের নাছোড়বান্দা আচরনের কারণে সচেতনতার গূঢ় রহস্যও সমাধান হয়ে যাবে।

স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিকের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়াটাই অস্বাভাবি এবং অতিপ্রাকৃতের ভবিষ্যৎ। প্রকৃতপক্ষে, অস্বাভাবি এবং অতিপ্রাকৃত বলতে কিছু নেই। আছে শুধু স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক......... আর আছে শুধু কিছু রহস্য যা এখনো ব্যাখ্যা করা যায়নি এই যা।

ইএসপি এবং মনের প্রমাণ

একশ' বছরেরও বেশি সময় ধরে পিএসআই (psi) বা সাইকিক প্রপঞ্চের উপস্থিতি আছে বলে দাবি করা হচ্ছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চের মত সংগঠনগুলো গড়ে উঠেছিল psi গবেষণায় কঠোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য। সে কাজে সহায়তা দেওয়ার জন্য তাদের হাতে বিশ্ব মানের বৈজ্ঞানিকও ছিল। বিংশ শতাব্দীর বিশ শতকে জোসেফ রাইনের ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষণ থেকে শুরু করে নব্বই এর দশকে করা ড্যারিল বেম এর কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার মত মাঝে মাঝেই সিরিয়াস একাডেমিক রিসার্চের সুবিধাও পেয়েছে psi।

উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে বেম এবং তার প্রাক্তন ইউনিভার্সিটি অব এডিনবার্গ প্যারাসাইকোলোজিস্ট সহকর্মী চার্লস হনর্টন তাদের প্রবন্ধ 'Does Psi Exist? Replicable Evidence for an Anomalous Process of Information Transfer' নামকরা রিভিউ জার্নাল Psychological Bulletin এ প্রকাশ করেন। চল্লিশটা প্রকাশিত প্রবন্ধের মেটা-এনালাইসিস (meta-analysis) করে লেখকদ্বয় উপসংহারে পৌঁছেছেন এভাবেঃ

Psi এর পক্ষে প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও (সাফল্যের হার ৩৫ শতাংশ, যেখানে ২৫ শতাংশ হার দৈবক্রমে হওয়াটা প্রত্যাশিত) বেম এবং হনর্টন হায় হুতাশ করেছেন এই বলে যে, বেশিরভাগ একাডেমিক মনোবিজ্ঞানী তথ্য বা শক্তির ব্যতিক্রমী প্রক্রিয়ায় স্থানান্তর, যাকে psi বলা হয় (যেমন, টেলিপ্যাথি বা অন্য ধরনের ইন্দ্রিয়াতীত অনুধাবন, যা বর্তমানে জানা বস্তুগত এবং জৈবিক মেকানিজম অনুযায়ী অব্যাখ্যাত), তার অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না।

বিজ্ঞানীরা কেন psi গ্রহণ করেন নাই? বিজ্ঞানের জগতে ড্যারিল বেমের একনিষ্ঠ গবেষক বলে বিরাট সুনাম রয়েছে এবং তিনি psi গবেষণায় পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ সব ফলাফল প্রদর্শন করেছেন। নতুন তথ্য এবং প্রমাণ হাজির করলে বিজ্ঞানীদের কি তাদের পুরনো মনোভাব পাল্টানোর কথা না? তাহলে কেন সংশয়? সংশয়ের মূল কারণ হচ্ছে, কোন গবেষণার গ্রহণযোগ্যতার জন্য প্রতিরূপযোগ্য (Replicable) ডাটা এবং সামর্থময় (Viable) তত্ত্বের প্রয়োজন, যার দুটোই psi গবেষণায় অনুপস্থিত ছিল।

> **ডাটাঃ** মেটা-এনালাইসিস এবং গ্যাঞ্জফেল্ড কৌশল দুটোই পরবর্তীতে ভয়ংকর তোপের মুখে পড়েছিল। ইউনিভার্সিটি অব অরিগনের রে হাইম্যান (Ray Hyman) বিভিন্ন গ্যাঞ্জফিল্ড পরীক্ষণে ব্যবহৃত পরীক্ষণ ক্রিয়াবিধির মধ্যে অসামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছেন (বেমের মেটা-এনালাইসিসে সেগুলোকে এমনভাবে একত্রিত করা হয়েছে যেন সেগুলো একই ক্রিয়াবিধি অনুসরণ করে।)। ওই রকম ভিন্নধর্মী ডাটা সেটের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পরিসংখ্যান পরীক্ষাও (Stouffer's Z) অনুপযোগী ছিল। তিনি টারগেট রান্ডমাইজেশন প্রক্রিয়াতেও (যে সিকোয়েন্সে ভিসুয়াল টারগেট রিসিভারে পাঠানো হয়।) খুঁত খুঁজে পান। যার কারণে লক্ষ্য নির্বাচন পক্ষপাতদুষ্ট হয়েছিলঃ 'গবেষণায় সব তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য এসেছিল টারগেটের দ্বিতীয় অথবা তার পরবর্তী উপস্থিতিতে। আমরা যদি প্রথম উপস্থিতির ক্ষেত্রে অনুমানকে পরীক্ষা করি তাহলে দেখতে পাবো যে ফলাফল দৈবর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ইউনিভার্সিটি অব হার্টফোর্ডশায়ারের রিচার্ড ওয়াইজম্যান (Richard Wiseman) তিরিশটারও বেশি গ্যাঞ্জফিল্ড পরীক্ষণ নিয়ে একটি মেটা-এনালাইসিস করেও psi এর কোন হদিস খুঁজে পাননি। ফলে তিনি উপসংহার টানেন এই বলে যে, psi ডাটা প্রতিরূপযোগ্য নয়। বেম তার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ এরকম আরো দশটা গ্যাঞ্জফিল্ড গবেষণা আছে বলে পালটা দাবি করেন এবং সেগুলো নিয়ে আরো কাজ করে তা প্রকাশ করার পরিকল্পনা তার রয়েছে বলে জানান। আর এইভাবেই শুরু হয় ডাটা নিয়ে বিতর্ক যা ডেকে নিয়ে আসে আরো অনেক অনেক যুক্তিতর্ক।
>
> **তত্ত্বঃ** ভবিষ্যতে যদি আরো তাৎপর্যপূর্ণ ডাটাও প্রকাশিত হয় তা হলেও psi এর ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা সন্দিহান আছেন বা ভবিষ্যতেও থাকবেন। এর পিছনের জোরালো কারণ হচ্ছে যে, psi কীভাবে কাজ করে সে বিষয়ে ব্যাখ্যামূলক কোন তত্ত্ব নেই। যতদিন পর্যন্ত না psi এর অনুগামীরা ব্যাখ্যা করতে পারবেন যে, কীভাবে প্রেরকের মস্তিষ্কে নিউরন কর্তৃক তৈরি করা চিন্তাসমূহ মগজের খুলি ভেদ করে গ্রহীতার মস্তিষ্কে পৌঁছবে ততদিন পর্যন্ত এই সংশয় থেকেই যাবে। এমনকি উপাত্ত যদি দেখায়ও যে psi এর উপস্থিতি আছে, যা ব্যাখ্যার প্রয়োজন (আমি নিশ্চিত যে তা নেই), তারপরও আমাদের কার্যকারণ সম্পর্কটা প্রয়োজন।

কোয়ান্টাম সচেতনতা

দীপক চোপড়া এবং অন্যেরা হয়তো পালটা যুক্তি দেবে যে, psi এর অকাট্য তত্ত্ব রয়েছে এবং তা হচ্ছে কোয়ান্টাম সচেতনতা। দারুণ জনপ্রিয় এবং একটা অদ্ভুত ধরনের নামের চলচ্চিত্র 'What the Bleep! Do We Know!?' তে কোয়ান্টাম সচেতনতা দেখানো হয়েছে। চাতুর্যপূর্ণ সম্পাদনার এই চলচ্চিত্রে

অভিনেত্রী মার্লি ম্যাটলিন একজন স্বপ্নালু ফটোগ্রাফারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এই চরিত্রটি আপাত অর্থহীন মহাবিশ্বকে অর্থপূর্ণ করার চেষ্টা করছে। চলচ্চিত্রটির মূল বিষয় হচ্ছে সচেতনতা আর কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মাধ্যমে আমরা আমাদের নিজেদের বাস্তবতা তৈরি করি। ছবিটি যে সপ্তাহান্তে মুক্তি পেয়েছিল তার আগেই এর প্রযোজকের সাথে ওরিগনের পোর্টল্যান্ডে একটি টেলিভিশন শোতে আমার দেখা হয়েছিল। ফলে, প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার আগেই আমি ছবিটি দেখে ফেলেছিলাম। আমি কখনোই ভাবি নাই যে, সচেতনতা এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্সের উপর কোন চলচ্চিত্র সফল হতে পারে। কিন্ত আশ্চর্যজনকভাবে ছবিটা কয়েক মিলিওন ডলার আয় করে ফেলে এবং এর একধরনের একটা কাল্ট অনুসারীও তৈরি হয়ে যায়।

এই চলচ্চিত্রের অবতাররা হচ্ছেন গোঁড়া নিউ এজ পন্থী বিজ্ঞানীরা। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ক্যালটেক পদার্থবিদ মুরে গেল-ম্যানের (Murray Gell-Mann) ভাষায়, এদের তত্ত্বকথার ফুলঝুরি, 'কোয়ান্টাম বকবকানি' ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন ধরুন ইউনিভার্সিটি অব অরিগনের কোয়ান্টাম পদার্থিবিজ্ঞানী অমিত গোস্বামী বলেছেন যে, 'আমাদের চারপাশের বস্তুগত জগত সম্ভাব্য সচেতনতার নড়চড় ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি প্রতি পলে পলে আমার অভিজ্ঞতা বেছে নিচ্ছি। হাইজেনবার্গ বলেছেন পরমাণুসমূহ বস্তু নয়, বরং প্রবনতা'। ঠিক আছে অমিত। আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি। পারলে বিশ তলা বিল্ডিং এর উপর থেকে লাফিয়ে পড়ুন এবং ভূমির প্রবনতার মধ্য দিয়ে নিরাপদে অতিক্রম করে যাওয়ার অভিজ্ঞতা সচেতনভাবে বেছে নিন।

The Message of Water গ্রন্থের জাপানী লেখক গবেষক মাসুরা এমোটোর গবেষণা হচ্ছে কীভাবে মানুষের চিন্তা বরফের ক্রিস্টালের আকৃতি পরিবর্তন করে দেয় তা দেখানো। এক গ্লাস পানি তার চারপাশে 'ভালবাসা' শব্দ জড়িয়ে সৌন্দর্যমন্ডিত বেশ কিছু ক্রিস্টালে পরিণত হয়ে যায়। আবার এলভিস প্রিসলির 'Heartbreak Hotel' বাজালে এক টুকরো ক্রিস্টাল ভেঙ্গে দুই টুকরায় পরিণত হয়। তাহলে কি এলভিসের 'Burnin' Love' বাজালে পানি ফুটতে শুরু করবে? তাইতো হওয়ার কথা, তাই না?

ছবিটারর সবচেয়ে দুর্বলতম অংশ হচ্ছে ৫৮ বছর বয়স্কা মহিলা J. Z. Knight শরীরের মধ্যে ভর করা ৩৫০০০ বছর বয়সী প্রেতাত্মা 'রামথা'র সাক্ষাৎকার। আমার ভাবনা হচ্ছে ৩৫০০০ বছর আগে কোন অঞ্চলের মানুষ ভারতীয় উচ্চারণে ইংরেজীতে কথা বলতো কে জানে। চলচ্চিত্রের অনেক প্রযোজক, লেখক এবং অভিনেতারা রামথার 'School of Enlightement' এর সদস্য। এই স্কুলে সপ্তাহান্তে নিউ এজ এর ধ্যান ধারণা শেখানো হয়।

কোয়ান্টাম জগতের অদ্ভুতুড়তার সাথে (যেমন, হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার সূত্র, যেখানে বলা হয়েছে যে যখনই কোন কণিকার অবস্থান সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়, তখনই তার গতি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এর উল্টোটাও হতে পারে যেখানে গতি নিশ্চিতভাবে জানা গেলে অবস্থান অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।) বৃহৎ জগতের রহস্যময়তার (যেমন সচেতনতা) সংযোগ সাধনের চেষ্টা নতুন কিছু নয়। এ দুটোর সর্বোত্তম সংযোগ ঘটিয়েছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী রজার পেনরোজ এবং চিকিৎসক স্টুয়ার্ট হ্যামেরফ। যাদের কোয়ান্টাম তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক মহলে আলোর চেয়ে উত্তাপই বেশি পরিমাণে ছড়িয়েছিল।

আমাদের নিউরনের মাঝখানে কিছু ক্ষুদ্রাকৃতির ফাঁপা মাইক্রোটিউবুলেস আছে যেগুলো কাঠামোগত খুঁটি হিসাবে কাজ করে। ধারণা (এবং এটা শুধু ধারণাই, আর কিছু নয়) করা হয় যে, মাইক্রোটিউবুলেসের মধ্যে কোন কিছু হয়তো ওয়েভ ফাংশন পতনের একটা সূত্রপাত ঘটায়, যার ফলে পরমাণুগুলোর কোয়ান্টাম সমন্বয়ের সৃষ্টি হয়।। পরিণতিতে নিউরনসমূহের মাঝে সিনাপ্সে নিউরোট্রান্সমিটার নির্গমন হয় এবং এর ফলে তারা একসাথে একইভাবে বিকশিত হয়ে চিন্তা এবং সচেতনতা তৈরি করে। যেহেতু ওয়েভ ফাংশনের পতন কেবলমাত্র কোন পরমাণু ‘পর্যবেক্ষিত’ (কোন কিছু দিয়ে যে কোনভাবে প্রভাবিত হলে) হলেই ঘটতে পারে, সেহেতু এই ধারণার আরো একজন প্রস্তাবক স্নায়ুবিজ্ঞানী স্যার জন একলেস (John Eccles) বলেন যে, খুব সম্ভবত ‘মন’ই হয়তো অণু থেকে পরমাণু, নিউরন, চিন্তা, সচেতনতার পৌণপুণিক চক্রের পর্যবেক্ষক।

বাস্তবে, সাব এটোমিক কোয়ান্টাম এফেক্ট এবং বৃহৎ আকারের ম্যাক্রো সিস্টেমের ব্যবধান এতো বেশি যে তাদের মধ্যে সংযোগ সাধন সম্ভবপর নয়। কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্টিকল পদার্থবিজ্ঞানী ভিক্টর স্টেনগার তার গ্রন্থ The Unconcious Quantum - এ দেখিয়েছেন যে একটি সিস্টেমকে কোয়ান্টাম মেকানিক্স হিসাবে বর্ণনা করতে হলে এর গড় *m*, গতি *v* এবং দূরত্ব *d* কে অবশ্যই প্লাঙ্কের (Planck) ধ্রুবক *h* এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ‘যদি *mvd*, *h* এর চেয়ে অনেক বেশি হয় তাহলেই কেবল সিস্টেমকে মেনে নেওয়া যেতে পারে’। স্টেনগার হিসাব করে দেখেছেন যে, সিন্যাপ্সের দূরত্বে নিউরাল ট্রান্সমিটার মলিকিউলস এর ভর এবং তাদের গতি প্রায় তিনগুন বেশি, যা কোয়ান্টাম প্রভাবকে কার্যকর করার জন্য খুব বেশি বড়। মাইক্রো-ম্যাক্রো সংযোগ বলে কিছু নেই। যখন তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করা হয় তখন সাব এটোমিক পার্টিকলগুলো হয়তো পরিবর্তিত হয়, কিন্তু চাঁদ ঠিকই চাঁদের জায়গায় থেকে যায় তা সে কেউ তার দিকে তাকাক বা না তাকাক। কি যে ঘোড়ার আন্ডাটা হচ্ছে এখানে কে জানে?

বিজ্ঞানের ইতিহাস মনের অন্তর্নিহিত কার্যাবলী ব্যাখ্যা করার অসংখ্য স্বাপ্নিক কিন্তু ব্যর্থ কর্মকাণ্ড দিয়ে ভর্তি। সকল মানসিক কার্যাবলীকে ঘূর্ণায়মান পরমাণু, যা মূলতঃ এগিয়ে যাচ্ছে চেতনার দিকে, তার কার্যাবলী হিসাবে ব্যাখ্যা করা থেকেই এই কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে প্রায় চারশ’ বছর আগে ডেকার্ট (Descarte) এর বিখ্যাত উচ্চাকাঙ্খী প্রচেষ্টা থেকে। এই ধরনের কার্টেসিয়ান স্বপ্ন এক ধরনের নিশ্চয়তা প্রদান করে, কিন্তু খুব দ্রুত তা জীববিজ্ঞানের জটিলতার মুখোমুখি হয়ে ফিকে হয়ে যায়। আমাদের উচিত স্নায়বীয় পর্যায়ে এবং আরো উঁচুতে চেতনার খোঁজ করা যেখানে কার্যকারণ বিশ্লেষণ উত্থান এবং আত্ম-সংগঠনের মত নীতির দিকে দিক নির্দেশ করেছে।

সাইকিক মাধ্যমতা এবং মৃতের সাথে কথা বলা

দীপক চোপড়া একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করেছেন। সেই গবেষণায় তিনজন সাইকিক দাবি করছিল যে তারা পরলোকে চলে যাওয়া লোকজনের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। যদিও কোন সাইকিককেই বলা হয়নি যে দীপক সেখানে উপস্থিত ছিল, তা সত্ত্বেও দুইজন তাকে নাম ধরে সনাক্ত করে ফেলেছিল। দুইজন বলেছিল যে সে তার সদ্য মৃত বাবার সাথে যোগাযোগ করতে চায় এবং এর মধ্যে একজন তার ছেলেবেলার ডাক নামও কিভাবে যেন জানতো। দীপক এই

অভিজ্ঞতাকে খাঁটি অভিজ্ঞতা বলে দাবি করেছেন। যদিও তিনি স্বীকার করেছেন যে, তার এ বিষয়ে মনে কিঞ্চিৎ খুঁতখুঁতানি ছিল। বিশেষ করে যেহেতু দীপকের মতে, 'পরলোক থেকে আসা আমার বাবা ততটুকুই জিনিষই জানতো যতটুকু আমি জানি, তার চেয়ে বেশি কিছু না'।

এই কিঞ্চিৎ খুঁতখুঁতানি বেশিরভাগ লোকের সন্দেহবাতিকতার চেয়েও বেশি সন্দেহবাদী, বিশেষ করে এমন একটি আবেগপ্রবন লেখায় যেখানে মৃত ভালবাসার জনদের সাথে সংযোগ সাধনের প্রতিশ্রুতি দেয়। সাইকিকেরা কীভাবে মৃতদের সাথে কথা বলে? আমি এ বিষয়ে অনেক লেখালেখি করেছি। তবে সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় এটা এমন একটা চালাকি যেখানে দুটো কৌশলের বিশেষ প্রয়োজন হয়।

১. কোল্ড রিডিং বা সবজান্তার ভান করাঃ এখানে আপনি আক্ষরিক অর্থেই কারো সম্পর্কে কিছু না জেনেই ভান করবেন যে তার সম্পর্কে সবকিছু জানেন। আপনি অনর্গল প্রশ্ন করবেন এবং অসংখ্য মন্তব্য করেন এবং দেখবেন যে কোনটা ঝড়ে বক মরের মতো লেগে যায়। 'আমি প অক্ষরের নাম পাচ্ছি। দয়া করে বলবেন কি কে এটা? উনি আমাকে লাল রঙের একটা কিছু দেখাচ্ছেন। কী সেটা, প্লিজ? এরকম করে চলবে আরো কিছুক্ষণ। বেশিরভাগ মন্তব্যই হবে ভুলভাল ধরনের। তাতে অবশ্য কোন সমস্যা নেই। B.F. Skinner তার কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচরণের উপর পরীক্ষায় যেমন দেখিয়েছেন যে, লোকজনের শুধু দরকার মাঝে মাঝে তাদেরকে বুঝ দেওয়া যে সত্যি সেখানে কিছু একটা আছে (স্লট মেশিনে জুয়াড়িদের আটকে রাখার জন্য মাঝে মাঝেই তাদেরকে জিততে দিতে হয়)। এই ভণ্ড সাইকিকদের জারিজুরি ফাঁস করার উপর আমার করা WABC নিউইয়র্কের একটি অনুষ্ঠানে সাইকিক যখন নামধাম, তারিখ, রঙ, রোগব্যাধি, অবস্থা, পরিস্থিতি, আত্মীয়স্বজন, স্মারকবস্তুসমূহ এবং অন্যান্য বিষয় দ্রুতগতিতে বলে যাচ্ছিল তখন আমরা প্রথম মিনিটেই প্রায় প্রতি সেকেন্ডে একটি করে মন্তব্য গুনতে সক্ষম হয়েছিলাম। সাইকিকরা এতো দ্রুত গতিতে কথা বলে যে আপনাকে টেপ থামিয়ে পিছনে যেয়ে দেখতে হবে যে আসলে কি বলা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানের সাইকিকের সাফল্যের হার ছিল দশ শতাংশের চেয়েও কম। আর ওই দশ শতাংশ সাফল্যের ব্যক্তিরা ছিল তারাই যারা মনে মনে সুতীব্রভাবে চাচ্ছিল যেন তারা তাদের মৃত প্রিয়জনের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

২. ওয়ার্ম রিডিং বা জ্ঞাত মনোবিজ্ঞানের নিয়মের প্রয়োগঃ ওয়ার্ম রিডিং সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনোবিজ্ঞানের জানা নীতিগুলোকে ব্যবহার করে। ব্রিটিশ মনোবিশারদ এবং যাদুকর ইয়ান রোল্যান্ড (Ian Rowland) এর সাইকিক অনুমান কীভাবে করতে হয় সে সম্পর্কে অন্তর্জ্ঞানসম্পন্ন এবং বিশ্বকোষিক গ্রন্থ The Full Facts Book of Cold Reading বেশিরভাগ বাড়িতেই পাওয়া যাবে এমন সব বস্তুসমূহকে যাতে করে নিশ্চিতভাবে কাউকে বিশ্বাস করানো যাবে যে তাদের মৃত প্রিয়জন কক্ষে উপস্থিত আছে সহ উচ্চ সাফল্য সম্ভাবনাসম্পন্ন অনুমানসমূহের তালিকা প্রদান করেছে। তালিকার বিষয়গুলো এরকমঃ এক বাক্স পুরাতন ফটো, তার মধ্যে কিছু এলবামে সাঁটা, কিছু এলবামের বাইরে; পুরনো ওষুধপত্র, মেয়াদ উত্তীর্ণ মেডিক্যাল সাপ্লাই, খেলনা, বই, শৈশবের কোন স্মৃতি চিহ্ন; পরিবারের মৃত কোন ব্যক্তির

গয়নাগাটি; এক প্যাকেট তাস, যার মধ্যে একটা আবার খোয়া গেছে; নষ্ট হয়ে যাওয়া ইলেকট্রোনিক কলকবজা; হারিয়ে যাওয়া মানানসই কলম বাদে নোট প্যাড বা মেসেজ বোর্ড; ফ্রিজের গায়ে লাগানো বা টেলিফোনের পাশে রাখা জীর্ণ নোট; কোন শখের বিষয়ের উপর লেখা বই, পুরনো ক্যালেন্ডার, আটকে যাওয়া বা ঠিকমত খোলে না এমন কোন ড্রয়ার; হারিয়ে যাওয়া চাবি; নষ্ট হয়ে যাওয়া ঘড়ি ইত্যাদি। অতিপ্রাকৃত কিছু আছে বলে যারা ধারণা দিতে বাধ্য তাদের কিছু সাধারণ বিচিত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছেঃ হাটুতে দাগ, বাড়ীর ঠিকানায় ২ সংখ্যার উপস্থিতি; শৈশবে পানিতে পড়া জাতীয় দুর্ঘটনা, কোনদিন পুরাতন না হওয়া কোন পোশাক; ওয়ালেট বা পার্সে প্রিয়জনের ছবি; ছেলেবেলায় চুল বড় রাখা হত, কিন্তু বড় হয়ে ছোট চুল রাখা; জোড়ার একটা হারিয়ে যাওয়া কানের দুল ইত্যাদি ইত্যাদি। জেমস ভ্যান প্রাগ, সিলভিয়া ব্রাউন, রোজমেরি আলটিয়া এবং অন্যান্য মিডিয়াম যাদের উপর আমি ব্যাপক তদন্ত করেছি তারা সবাই মৃত্যুর কারণ হিসাবে বুক বা মস্তিষ্ক এলাকাকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষ। মৃত্যুর কারণ চিহ্নিত করার পর তারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় সেই মৃত্যু কি তরিত্ব গতিতে হয়েছে নাকি ধীর গতিতে হয়েছে সেদিকে। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে তারা মৃত্যুর অর্ধ ডজন প্রধান কারণকে বলে যেতে থাকে। ‘সে বলছে যে তার বুকে ব্যথা ছিল’। যদি এক্ষেত্রে তারা ইতিবাচক সাড়া পায়, তাহলে তারা এগিয়ে যেতে থাকে। ‘তার কি ক্যান্সার ছিল? কারণ আমি ধীরে ধীরে মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি’। যদি তারা হ্যাঁ সূচক উত্তর দেয়, তাহলে তারা সাথে সাথেই সাফল্যের কৃতিত্ব নিয়ে নেয়। যদি আত্মীয় স্বজনরা ইতস্তত করে তবে সেক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মৃত্যুর কারণ সরিয়ে নেয় হার্ট এটাকের দিকে। যদি মাথার কোন সমস্যার কারণে মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহলে তারা স্ট্রোক অথবা আছাড় খেয়ে পড়ে যেয়ে বা গাড়ি দুর্ঘটনা মস্তিষ্কের আঘাতের কথা উল্লেখ করে।

আমি একদিন নিজেই টেলিভিশনের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সাইকিকের ভূমিকা পালন করেছিলাম এবং খুব সহজেই অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে আমি মৃতদের সাথে কথা বলছি। এটা অবশ্য খুবই সহজ কাজ। যে কেউই ইচ্ছা করলে মৃতদের সাথে কথা বলতে পারে। কঠিন কাজ হচ্ছে মৃতদেরকে পালটা কথা বলানো। সাইকিক মিডিয়ামরা চতুর কৌশল ব্যবহার করে বিভ্রম তৈরি করার মধ্য দিয়ে ধারণা দেয় যে মৃতরা আমাদের সাথে কথা বলছে। এবং যেহেতু যারা মিডিয়ামের কাছে সাহায্যের জন্য আসে তার আবেগগতভাবে ভঙ্গুর থাকে, সেহেতু তারা খুব সহজেই মিডিয়ামদের প্রভাববিস্তারকারী পদ্ধতির ফাঁদে পড়ে যায়।

প্রার্থনা এবং রোগ নিরাময় গবেষণা

২০০৬ সালের এপ্রিলে The American Heart Journal স্বাস্থ্য এবং রোগীর নিরাময়ের উপর ফলদায়ক প্রার্থনার প্রভাব নিয়ে এ পর্যন্ত করা সবচেয়ে বিস্তারিত গবেষণা প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞান এবং ধর্মবিষয়ক গবেষণায় উদ্দেশ্যমূলক সহায়তা প্রদানকারী বলে পরিচিত টেম্পলিটন ফাউন্ডেশন (Templeton Foundation) এর অর্থানুকূল্যে এবং ‘প্রার্থনা ফলদায়ক’ এই মতের প্রবক্তা হার্ভার্ড

ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল স্কুলের কার্ডিওলোজিষ্ট হার্বার্ট বেনসন এর নেতৃত্বে পরিচালিত এই গবেষণার ফলাফল বিজ্ঞান এবং ধর্মে উৎসাহী উভয়পক্ষের লোকেরাই লুফে নেয়। ছয়টি আমেরিকান হাসপাতালের ১৮০২ জন রোগীকে এলোপাতাড়িভাবে তিনটি দলে ভাগ করা হয়। প্রার্থনা পাওয়া ৬০৪ জনকে বলা হয়েছিল যে তারা প্রার্থনা পেতেও পারে অথবা নাও পেতে পারে। ৫৯৭ জন কোন প্রার্থনা পায়নি এবং তাদেরকেও বলা হয়েছিল যে তারা প্রার্থনা পেতেও পারে অথবা নাও পেতে পারে। প্রার্থনা পাওয়া ৬০১ জনকে বলা হয়েছিল যে তারা প্রার্থনা পাবে। সার্জারির আগের রাত থেকে প্রার্থনা করা শুরু হয় এবং তা চলতে থাকে প্রতিদিন ধরে পরবর্তী দুই সপ্তাহ। প্রার্থনাকারীদেরকে নিজেদের মত করেই প্রার্থনা করার সুযোগ দেওয়া হয়। তবে বলে দেওয়া হয় যে তারা যেন ‘দ্রুত নিরাময় এবং কোন ধরনের জটিলতাহীন সাফল্যজনক সার্জারির’ জন্য প্রার্থনা করে থাকেন।

এই গবেষণার ফলাফল ছিল দ্ব্যর্থহীন। কোন দলের মধ্যেই স্ট্যাটিসটিক্যালি সিগনিফিক্যান্ট কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। তার মানে হচ্ছে প্রার্থনা কোন কাজে আসেনি। শুধু যে কাজে আসেনি তা নয় বরং আরো বাজে দিক হচ্ছে যে, যে দলের রোগীরা জানতো যে তাদের জন্য প্রার্থনা করা হবে তাদের মধ্যে সামান্য কিছু পরিমাণে বেশি জটিলতা (যদিও স্ট্যাটিসটিক্যালি সিগনিফিক্যান্ট নয়) দেখা দিয়েছিল। একে বলে ‘নোসেবো এফেক্ট’ (Nocebo Effect)। কাজেই, মামলা খতম।

আগের অনেক গবেষণায় যেখানে প্রার্থনার ইতিবাচক ফলাফলের দাবি করা হয়েছিল, সেগুলোতে নিচেরগুলো সহ অসংখ্য পদ্ধতিগত ত্রুটি ছিলঃ

১. নিয়ন্ত্রণের অভাবঃ এই গবেষণাসমূহের অনেকগুলোই বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক মর্যাদা, বৈবাহিক অবস্থা, ধর্মনিষ্ঠার মাত্রা ইত্যাদি হস্তক্ষেপকারী চলককে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে সব ধর্মই বহুগামিতা, মদ্যপান ও মাদকদ্রব্যের ব্যবহার এবং ধূমপানের মত অস্বাস্থ্যকর আচরণকে নিষিদ্ধ করেছে। ওই চলকগুলোকে যখন নিয়ন্ত্রণ করা যায় তখন আর আগের মতো তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফল থাকে না। বয়স্ক মহিলাদের নিতম্বের সার্জারি থেকে নিরাময়ের এক গবেষণায় বয়স চলককে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। গির্জায় উপস্থিতির হারের সাথে রোগ নিরাময়ের সম্পর্কের অন্য এক গবেষণা একেবারেই ধর্তব্যের মধ্যে নেয়নি যে অসুস্থ লোকজনেরা গির্জায় সাধারণত কম যেয়ে থাকে। এর সাথে সম্পর্কযুক্ত আরো একটি গবেষণা ব্যায়ামের পরিমাণ চলককেও নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

২. ফলাফলের পার্থক্যঃ গোঁড়া খ্রীষ্টানদের দ্বারা প্রার্থনাকৃত কার্ডিয়াক পেশেন্টদের উপর করা এক বহুল প্রচারিত গবেষণায় ২৯ টি ফলাফল চলক পরিমাপ করা হয়। কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র ৬ টি চলকে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। একই ধরনের অন্যান্য গবেষণায় বিভিন্ন ফলাফল পরিমাপ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থপূর্ণ হতে হলে একই পরিমাপগুলোকে একই ধরনের অন্যান্য গবেষণাগুলোতেও তাৎপর্যপূর্ণ হতে হবে। কারণ অনেক ফলাফল যদি পরিমাপ করা হয় তবে এদের মধ্যে কিছু কিছু দৈবক্রমেই তাৎপর্যপূর্ণ সহ-সম্পর্ক দেখাতে পারে।

৩. **ফাইল-ড্রয়ার সমস্যাঃ** ধর্মনিষ্ঠা এবং মরণশীলতার উপর করা কয়েকটি গবেষণায় (ধার্মিক লোকেরা অধার্মিকদের চেয়ে বেশি দিন বাঁচে বলে মনে করা হয়) বেশ কিছু ধর্মীয় চলক ব্যবহার করা হয়েছে। তবে সুচতুরভাবে সেগুলোই প্রকাশ করা হয়েছে যেগুলো এই দুইয়ের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ সহ-সম্পর্ক রয়েছে বলে প্রমাণ করেছে। অন্য গবেষণায় একই চলকসমূহ ব্যবহার করে ভিন্ন সহ-সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেছে। এবং সেখানেও অবশ্য শুধুমাত্র তাৎপর্যপূর্ণগুলোই প্রকাশ করা হয়েছে। বাকীগুলোকে অ-তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফলের ড্রয়ারে ফেলে রাখা হয়েছে। যখন সব সব চলককে একসাথে গাঁথা হয়, তখন দেখা যায় যে ধর্মনিষ্ঠার সাথে মরণশীলতার আসলে কোন সম্পর্ক নেই।

৪. **কার্যকর সংজ্ঞাঃ** প্রার্থনার প্রভাব নিয়ে যখন কোন পরীক্ষা করা হয় তখন মূলতঃ কি পর্যবেক্ষণ করা হয়? উদাহরণস্বরূপ, কোন ধরনের প্রার্থনা করা হয়? (খ্রীষ্টান, ইহুদী, মুসলমান, বৌদ্ধ, উইকান এবং শ্যামান প্রার্থনা কি একই?) কে বা কাকে প্রার্থনা করা হয়? (ঈশ্বর, যীশু এবং একটি বিশ্বজনীন জীবনী শক্তি কি সমপর্যায়ের?) প্রার্থনার কতক্ষণ ধরে এবং কতবার করা হবে? (দুইটা দশ মিনিটের প্রার্থনা কি বিশ মিনিটের একটা প্রার্থনার সমান?) কত জন লোক প্রার্থনা করছে এবং ধর্মে তাদের মর্যাদা কি জরুরী? (একজন পাদ্রীর প্রার্থনা কি দশজন উপাসনাকারীর প্রার্থনার সমান?) বেশিরভাগ প্রার্থনা গবেষণায় এই ধরনের কার্যকর সংজ্ঞার অভাব রয়েছে অথবা এই ধরনের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গবেষণায় কোন মিলই নেই।

৫। **ধর্মতাত্ত্বিক জটিলতাঃ** ঈশ্বর যদি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান্ হয় তাহলে তাকে স্মরণ করানো বা স্তুতিবাক্যে তুষ্ট করানোর কোন প্রয়োজনই নেই যে কারো নিরাময়ের প্রয়োজন। প্রার্থনা করার পরেও যে সকল রোগী মারা গেছে তাদেরই বা ব্যাখ্যা কি? বৈজ্ঞানিক প্রার্থনা ঈশ্বরকে স্বর্গীয় গবেষণাগারের ইঁদুরে পরিণত করেছে যা জন্ম দিয়েছে অপবিজ্ঞান এবং নিকৃষ্ট ধর্মের।

তথ্য ক্ষেত্র, মর্ফিক অনুরণন, এবং বিশ্বজনীন জীবনী শক্তি

আপনি কি কখনো খেয়াল করেছেন যে দিনের শেষে সংবাদপত্রের শব্দজট (crossword puzzle) খোলা অনেক সহজ? আমি কখনোই খেয়াল করি নাই। রুপার্ট শেলড্রেক এর মতে যেহেতু সকালের সম্মিলিত সাফল্য সাংস্কৃতিক মরফিক ক্ষেত্র দিয়ে রিজোনেট করে সে কারণেই এটা সম্ভবপর হয়। শেলড্রেকের মরফিক রিজোনান্স তত্ত্বে (মরফ বা 'তথ্যের ক্ষেত্র') একই ধরনের ক্ষেত্র স্পন্দন তোলে এবং বিশ্বজনীন শক্তির মধ্যে তথ্য আদান প্রদান করে। সময়ের সাথে সাথে প্রত্যেক ধরনের প্রাণীই এক একটি বিশেষ ধরনের একমুখী সম্মিলিত স্মৃতিতে পরিণত হয়। শেলড্রেক তার ১৯৮১ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ 'A New Science of Life' এ লিখেছেন 'প্রকৃতির নিয়মতান্ত্রিকতা অভ্যাসগত। বস্তু বা বিষয়সমূহ যেমন আছে তেমনই আছে, কারণ তারা যেমন ছিল তেমনই আছে'। শেলড্রেক বলেছেন, মরফিক রিজোনান্স হচ্ছে 'অরগানিজম এবং প্রজাতির ভিতরকার সম্মিলিত স্মৃতির রহস্যময় টেলিপ্যাথি ধরনের আন্তঃসম্পর্কের

ধারণা' এবং ভৌতিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হোমিং পিজিওন, কীভাবে কুকুর টের পায় মনিব বাড়ী ফিরেছে বা আড়াল থেকে কেউ তাকিয়ে থাকলে টের পেয়ে যাওয়া ইত্যাদি বিষয় ব্যাখ্যা করেছে। শেলড্রেক ব্যাখ্যা করেছেন যে, 'দৃষ্টির হয়তো দ্বিমুখী প্রক্রিয়া আছে, আলোর অন্তর্মুখী গমন এবং মানসিক প্রতিচ্ছবির বহির্মুখী নির্গমন'। শেলড্রেকের ওয়েবপেজ থেকে এক্সপেরিমেন্টাল প্রটোকল ডাউনলোড করে হাজার হাজার মানুষ পরীক্ষা করেছেন এবং সেই সব পরীক্ষা ইতিবাচক, রিপিটেবল, এবং উচ্চ তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফল প্রদান করেছে। যার অর্থ হচ্ছে, পিছন থেকে কেউ তাকালে সেটা যে বোঝা যায় সে বিষয়ে ব্যাপক বিস্তৃত অনুভূতিপ্রবণতা রয়েছে।

আসুন, এই দাবিকে ভালভাবে পরীক্ষা করা যাক। প্রথমতঃ কোন ওয়েবপেজ প্রটোকলের ভিত্তিতে অপরিচিত লোকদের মাধ্যমে কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সাধারণত ঘটে না। এক্ষেত্রে জানার কোন উপায়ই নেই যে ওই সমস্ত অপেশাদার লোকেরা ইন্টারভেনিং চলকসমূহ এবং পরীক্ষকের পক্ষপাতকে কীভাবে সামাল দিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ মনোবিজ্ঞানীরা এই ধরনের বর্ণনাকে বিপরীত আত্ম-সন্তুষ্টি প্রভাব বলে বাতিল করে দেনঃ একজন লোক কেউ তাকে পিছন থেকে দেখছে ভেবে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে, ওই ঘাড় ঘোরানো যে লোক দেখছে বলে মনে করা হচ্ছে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, ফলশ্রুতিতে সেই লোক প্রথম ব্যক্তির দিকে তাকাবে। আর তাতেই প্রথম ব্যক্তি নিশ্চিত হবে যে তার দিকে কেউ তাকাচ্ছে সেই অনুভূতিটা আসলেই সত্যি। তৃতীয়তঃ ২০০০ সালে লন্ডনের মিডলসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জন কাউয়েল শেলড্রেকেরে প্রস্তাবিত পরীক্ষণ প্রটোকল ব্যবহার করে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি পরীক্ষা চালান। তিনি এই পরীক্ষার জন্য ১২ জন স্বেচ্ছাসেবককে ব্যবহার করেন যারা প্রত্যেকেই ১২ টা সিকোয়েন্সে ২০ বার তাকানো এবং না তাকানো পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। শেষ নয়টা সেশনে নির্ভুলতার ফিডব্যাক দেওয়া হয়। ফলাফল হচ্ছে, পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা তাদের দিকে কেউ তাকাচ্ছে কিনা তা সঠিকভাবে তখনই বলতে পেরেছিল যখন তাদেরকে নির্ভুলতার ফিডব্যাক দেওয়া হয়েছিল। কাউয়েলের মতে এর কারণ হচ্ছে, অংশগ্রহণকারীরা আসলে জেনে গিয়েছিল যে পরীক্ষার ট্রায়ালগুলির অনুক্রমে দৈবতা (Note: দৈবতা – randomness) ছিলনা। ইউনিভার্সিটি অব হার্টফোর্দসশায়ারের মনোবিজ্ঞানী রিচার্ড ওয়াইজম্যান শেলড্রেকের গবেষণার পুনরাবৃত্তি করার চেষ্টা করেন এবং দেখেন যে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা যে হারে তাদের দিকে চোরা দৃষ্টিকে সনাক্ত করতে পারেন তার হার দৈব হারের চেয়ে খুব বেশি নয়। চতুর্থতঃ পরীক্ষকের পক্ষপাতিত্বের সমস্যাও রয়েছে। ইন্সটিটিউট অব নোয়েটিক সায়েন্সেস এর গবেষক ম্যারিলিন শ্লিজ (psi বিশ্বাসী) ওয়াইজম্যানের (psi অবিশ্বাসী) সাথে শেলড্রেকের গবেষণার অনুকরণ করেন এবং দেখেন যে, যেখানে শ্লিজের ফলাফল এসেছে পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ সেখানে ওয়াইজম্যানের ফলাফল হয়েছে পুরোপুরি দৈব।

শেলড্রেক বলেন যে, সংশয়বাদীরা মরফিক ফিল্ডের সুপ্ত ক্ষমতাকে অবহেলা করে, যেখানে বিশ্বাসীরা এই ক্ষমতাকে আরো বর্ধিত করে। ওয়াইজম্যানের ক্ষেত্রে শেলড্রেকের মন্তব্য হচ্ছে, 'সম্ভবত বিষয়টি সম্পর্কে তার নেতিবাচক প্রত্যাশা সচেতন বা অচেতনভাবে তার গবেষণায় প্রভাব ফেলেছে'।

হয়তো। কিন্তু কথা হচ্ছে কীভাবে আমরা নেতিবাচক psi এবং না-psi এর মধ্যে পার্থক্য করতে পারি? কথায় আছে না, অদৃশ্য আর অস্তিত্বহীনকে যে একই রকম বলে মনে হয়।

মধ্য ভূমি

কথা হচ্ছে, তাহলে অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে কি? প্রকৃতিগতভাবে আমি বেশ আশাবাদী ধরনের মানুষ। কাজেই, আমি বর্তমান অবস্থায় সন্দেহগ্রস্থ ভবিষ্যতের অগ্নিশিখায় সংশয়বাদের ঠান্ডা পানি ঢেলে দিতে চাই না। তবে আমি সত্য হিসাবে কি আশা করি তার চেয়ে প্রকৃত সত্য কি তাকেই বেশি গুরুত্ব দেই। এবং সেভাবেই আমি বিষয়গুলোকে অনুধাবন করি।

আমি চোপড়া, বেম, গোস্বামী, শেলড্রেক এবং তাদের মতো আরো অনেককেই জানপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে চাই। সত্যি সত্যিই চাই। আমি স্কুলে থাকা অবস্থাতেই ধর্মকে পরিত্যাগ করেছি। কিন্তু মাঝে মাঝেই আমি আমার বিজ্ঞান এবং প্রকৃতির দিকে ধাবমান মনকে আমার প্রাক্তন এভানজেলিক অনুভূতিতে হাবুডুবু খেতে দেখি। এ কারণেই বলা যেতে পারে আমি সংশয়বাদী। এভানজেলিকরা যা দেয় সেটা হচ্ছে অনেকখানি ধর্মের মতোই। সব কিছুরই প্রত্যাশা দেয়, কিন্তু আসলে কিছুই দেয় না (শুধু আশা ছাড়া)। এবং পুরোটাই আসলে বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীত বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমি বিশেষ করে সংশয়াচ্ছন্ন হই তখনই যখন দেখি মানুষ বলাবলি করে যে 'বিশাল কিছু' আমাদের জীবদ্দশায় আমাদেরকে রক্ষা করবে এবং আমাদের গভীরতম আবেগগত চাহিদাকে পরিপূর্ণ করবে। এভানজেলিকরা কখনোই দাবি করে না যে পরবর্তী প্রজন্মেই যীশুর পুনরুত্থান ঘটতে যাচ্ছে (অথবা অন্যেরা পরিত্রাণ পেয়ে যাবে শুধু তারা ছাড়া।) একইভাবে 'ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী' মতের ধর্মনিরপেক্ষ প্রবক্তারা সাধারণত তাদের বরাদ্দ সময়সীমার মধ্যেই সভ্যতার ধ্বংস হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন (এবং অতি অবশ্যই সেই কেয়ামত থেকে সামান্য যে ক'জন রক্ষা পাবে তারাই হবে তার অংশ)। একইভাবে, ধর্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষ ইউটোপিয়া উভয়েরই ভবিষ্যৎবক্তারা তাদের নিজেদেরকে বাছাই করা কতিপয় লোক ভাবেন এবং মনে করেন যে স্বর্গ তাদের একেবারে হাতের মুঠোয়।

স্বর্গ কোথায়? এখানেই স্বর্গ। বর্তমানই হচ্ছে আমাদের স্বর্গ। আমাদের মধ্যেই স্বর্গ আবার আমাদেরকে ছাড়াই স্বর্গ। আমাদের চিন্তা এবং কাজের মধ্যেই স্বর্গ নিহিত। আমাদের জীবন এবং ভালবাসাতেই সিক্ত স্বর্গ। আমাদের পরিবার এবং বন্ধুদের মধ্যেই স্বর্গ দীপ্তমান। আমাদের প্রত্যয়ের বলিষ্ঠতা এবং আত্মার বৈশিষ্ট্যতার মাঝেই বিরাজমান স্বর্গ।

জীবন চিরস্থায়ী না হলেও, আশা ঠিকই জেগে থাকে চিরন্তন।

মায়ামি, ফ্লোরিডা
farid300@gmail.com

মুক্তমনার মডারেটর। 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক।